Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা রহমান তুবা

রোলঃ 216021028

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা রহমান তুবা

রোলঃ 216021028

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবরিনা রহমান তুবা, আইডিঃ 216021028 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sabrina

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

সাবরিনা রহমান তুবা

আইডিঃ 216021028

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6
নামাজের পরিচয় 7
নামাজের বিবরণ ও রাকাআত সংখ্যা 7
নামাযের আদেশ 9
নামাজের সময় 15
নামাজের মাকরূহ ও নিষিদ্ধ সময় 18
নামাজের মাকরূহ সময় 18
নামাজের আহকাম 19
নামাজের আরকান 19
সালাতের রোকন, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মাকরুহ ও সালাত ভঙ্গকারী বিষয় : 20
নামাজের ওয়াজিব 23
সালাত ভঙ্গকারী বিষয় 24
নামাজে খুশু-খুযু 25
সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত 27
সালাত বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত 29
সালাতের পূর্ববর্তী আদব 32
পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নামাযের নির্দেশ 35
দুনিয়া ও আখিরাতের আলোকে সালাতের গুরুত্ব 40
কুরআন ও হাদিসের আলোকে নামাজের ফজিলত 48
জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত 51
ঐচ্ছিক সালাত (নফল সালাত) 56
বে-নামাজীর শাস্তি 59

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি বিশ্বজাহানের রব, অধিপতি এবং বিচার দিবসের মালিক। মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তিক জীবন ব্যবস্থার নাম হল ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ দ্বীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অন্যতম ও অত্যাবশ্যকীয় ফরজ বিধান হল সালাত এবং নবীজির শেষ আদেশ হল সালাত। সালাতের মাধ্যমে বান্দা ও রবের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর সেজদারত অবস্থায় বান্দা তাঁর রবের সর্বোত্তম নিকটে পৌঁছে যেতে পারে।

যারা সালাত আদায় করে না, তারা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত কে উত্তম? আমি নাকি শয়তান? আপনারা জানেন, ইবলিস অত্যন্ত ইবাদতগুজার একজন বান্দা ছিল। আল্লাহ যখন ফেরেশতাদেরকে আদমের প্রতি সাজদাবনত হতে আদেশ দিলেন, ইবলিশ তা প্রত্যাখ্যান করে বসলো। কেবল একটি সেজদা করতে এসে অস্বীকৃতি জানালো, এজন্য সে হয়ে গেল সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

৫ ওয়াক্ত মিলিয়ে ১৭ রাকাত সালাতে সর্বমোট ৩৪টি সাজদা। কাজেই যে ব্যক্তি একদিন সালাত ছেড়ে দেয় সে ৩৪ টি সাজদা ছেড়ে দেয়। ইবলিশ কেবল একটি সাজদার আদেশ অমান্য করাতে সে অভিশপ্ত, নিকৃষ্ট ও বিতাড়িত হিসেবে পরিণত হয়েছিল। তাহলে আমরা যারা দৈনিক সালাত আদায় করছি না, তাদের অবস্থা কি ইবলিশ থেকে অত্যন্ত ভয়াবহ নয়?

নামাজের পরিচয়

নামাজ শব্দটি ফারসি শব্দ। নামাজের আরবি শব্দ 'সালাত'। কোরআন ও হাদিসে সালাত শব্দটিই ব্যবহার হয়েছে। সালাতের আভিধানিক অর্থ হলো দোয়া করা, ডাকা,প্রার্থনা করা,বিনয়, সিজদা,ক্ষমা চাওয়া ইত্যাদ।

পারিভাষিক অর্থ:

সালাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদাত যা নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে দোয়া ও সূরা পাঠ করা এবং কিছু কাজ; যা তাকবীরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। অন্যথায় বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত বিনয় সহকারে প্রণতি নিবেদনের মাধ্যমে এই ইবাদাত সম্পন্ন করতে হয় বলে একে নামাজ বলে।১

নামাজ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। নামাজ ফরজ ইবাদাত,কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমানিত।যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের ও জাহান্নামি।

নামাজের বিবরণ ও রাকাআত সংখ্যা

নবুয়াত প্রাপ্তির পর থেকেই নামাজ ফরয হয়। তবে তখন নামাজ ছিল কেবল ফজরে ও আছরে দু' দু' রাক'আত করে (কুরতুবী)।

যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

'আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন করুন সূর্যাস্তের পূর্বে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে'।২

এখানে عَشِي হল দিনের শেষ এবং রাতের প্রথম অংশ। আর أَبْكَار হল, রাতের শেষ এবং দিনের প্রথম অংশ।

মিরাজের রাত্রে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়।উক্ত নামাজ গুলো হলো;ফজর,যোহর,আছর,মাগরিব ও এশা।৩

....

১.কুরআন ও হাদিসের আলোকে রাসুলুল্লাহ্’র(সঃ)নামায।

২.সূরা আল মুমিন, আয়াতঃ৫৫।

৩.আবু দাউদ, ৩৯১-৩৯৩।

....

এছাড়া রয়েছে জুম‘আর ফরয নামাজ,যা সপ্তাহে একদিন শুক্রবার দুপুরে পড়তে হয়।৪

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাজ দিনে-রাতে মোট ১৭ রাক‘আত ও জুম‘আর দিনে ১৫ রাক‘আত ফরয এবং ১২ রাক‘আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ।আর সুন্নতে গয়রে মুয়াক্কাদাহ্ ৮ রাকা'আত।যেমন-

(১) ফজর : ২ রাক‘আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্, অতঃপর ২ রাক‘আত ফরয।

(২) যোহর : ৪ রাক‘আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্,অতঃপর ৪ রাক‘আত ফরয,অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্।

(৩) আছর : ৪ রাকা’আত সুন্নতে গয়রে মুয়াক্কাদাহ্,তারপর ৪ রাক‘আত ফরয।

(৪) মাগরিব : ৩ রাক‘আত ফরয।অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্।

(৫) এশা :৪ রাকা'আত সুন্নতে গয়রে মুয়াক্কাদাহ্, তারপর ৪ রাক‘আত ফরয,অতঃপর ২ রাক‘আত সুন্নাত।অতঃপর শেষে তিন বা এক রাক‘আত বিতর।

জুম‘আর নামাজ ২ রাক‘আত ফরয।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نُوۡدِیَ لِلصَّلٰوۃِ مِنۡ یَّوۡمِ الۡجُمُعَۃِ فَاسۡعَوۡا اِلٰی ذِکۡرِ اللّٰہِ وَ ذَرُوا الۡبَیۡعَ ؕ ذٰلِکُمۡ خَیۡرٌ لَّکُمۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ۝

অর্থঃহে মুমিনগণ,যখন জুমু‘আর দিনে সালাতের জন্য আহবান করা হয়,তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও।আর বেচা-কেনা বর্জন কর।এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম,যদি তোমরা জানতে।(আল-বায়ান)৫

তার পূর্বে মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বে কমপক্ষে ২ রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ এবং জুম‘আ শেষে ৪ অথবা ২ রাক‘আত সুন্নাত।

উপরে বর্ণিত সবগুলিই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিয়মিত আমল দ্বারা নির্ধারিত এবং সহীহ হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

....

৪.মিশকাত,১৩৫৪;বুখারী,৮৭৬

৫.সূরা জুমা, আয়াত:৯

....

নামাযের আদেশ

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাযের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।-সূরা বাকারা (২) : ৪৩

অন্যত্র বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

এবং তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা কর, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।-সূরা হজ্ব (২২) : ৭৮

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয় নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড় নিআমত। এ নিআমতের শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তাঁকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।

এ থেকে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি এও বোঝা যায়, এই নিআমতের শুধু মৌখিক শোকরিয়া আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং আমলগতভাবেও শোকরিয়া আদায় করতে হবে। যে সকল আমল দ্বারা এ নিআমতের শোকরিয়া আদায় করা যায় তার শীর্ষে রয়েছে নামায, যাকাতসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা।

অপর আয়াতে নবীজীকে লক্ষ করে বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَیُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِیَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَ یَوْمٌ لَّا بَیْعٌ فِیْهِ وَلَا خِلٰلٌ.

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না।-সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩১

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।

অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি নবীজীকে নামাযের আদেশ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ الَّیْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরের নামায (কায়েম কর)। নিশ্চয় ফজরের নামাযে সমাবেশ ঘটে।-সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮

সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা কোন্ কোন্ নামায বুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায। আর ফজরের নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে।

নবীজীকে নামাযের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

এবং তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক।–সূরা হূদ (১১) : ১১৪

দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহয় এর পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে।

আমরা লক্ষ করেছি এখানে নামাযের আদেশ করা হয়েছে, সেইসঙ্গে বলা হয়েছে, পুণ্য পাপকে দূর করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় নামায খুব মর্যাদাপূর্ণ আমল এবং এর দ্বারা গোনাহ মাফ হবে।

নবীজীকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন-

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ও নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।-সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫

এখানেও নামাযের আদেশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু উপকারিতাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। হাঁ, নামাযের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। তবে প্রাণবন্ত নামায হতে হবে। যেরূপ নামাযের কথা কুরআন ও হাদীস বলে।

কুরআন হুকুম-আহকাম আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত পুংলিঙ্গের সম্বোধন করে। দ্বিমত নেই যে, পুরুষের মত মহিলারাও এসব আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত। কুরআনে এক স্থানে নবীপত্নীদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাতে নামাযের আদেশও রয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন-

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

হে নবী পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায় পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামায কায়েম কর। যাকাত আদায় কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র করতে।-সূরা আহযাব (৩৩) : ৩২-৩৩

নামাযের আদেশ সম্পর্কিত আরো আয়াতের জন্য দেখুন, সূরা বাকারা ১১০, সূরা আনআম ৭২, সূরা নূর ৫৬, সূরা রূম ৩১, সূরা মুজাদালা ১৩

আদেশমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ। আদেশকারীর মর্যাদা এবং আদেশের ধরন ও অবস্থা অনুপাতে গুরুত্ব আরো বেশি হয়। আদেশকারী যত বড় হয় আদেশ তত বেশি গুরুত্ব বহন করে। এমনিভাবে যখন বারবার ও বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয় তখনো আদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নামাযের আদেশ যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যিনি সবচেয়ে বড় এবং বিভিন্নরূপে করেছেন, সরাসরি বান্দাদের করেছেন, নবীর মাধ্যমে করেছেন, সরাসরি নবীকে করেছেন, নবীপত্নীদের করেছেন, তাই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশি।

....

৬. নামাজের গুরুত্ব ও ফযীলত বই

....

নামাজের সময়

প্রত্যেক নামাজের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সময় নির্ধারন করে দিয়েছেন এবং হাদিস দ্বারাও তা প্রমানিত। সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

فَاِذَا قَضَيۡتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوۡدًا وَّ عَلٰى جُنُوۡبِكُمۡ ۚ فَاِذَا اطۡمَاۡنَنۡتُمۡ فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا

অর্থঃযখন তোমরা নামায আদায় করে নেবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন (যথানিয়মে) নামায কায়িম করবে। নির্দিষ্ট সময়ে নামায কায়িম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ حِيۡنَ تُمۡسُوۡنَ وَ حِيۡنَ تُصۡبِحُوۡنَ.وَ لَهُ الۡحَمۡدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيۡنَ تُظۡهِرُوۡنَ

অর্থঃঅতএব তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে।আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমান ও যমীনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। আল-বায়ান

সূরা রূমের উক্ত আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন।

....

৬.সূরা নিসা : (১০৩)

....

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাসান সহিহ;

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ . وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ . وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي مُوسَى وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّوَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَس. ٍ

অর্থঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জিবরীল (আঃ) কা’বা শরীফের চত্বরে দু’বার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। তিনি প্রথমবার যুহরের নামায আদায় করালেন যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া জুতার ফিতার মত ছিল। অতঃপর তিনি আসরের নামায আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করালেন যখন সূর্য ডুবে গেল এবং যে সময়ে রোযাদার ইফতার করে। অতঃপরতিনি আসরের নামায আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করালেন যখন সূর্য ডুবে গেল এবং যে সময়ে রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর ইশার নামায আদায় করালেন যখন লাল বর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর ফযরের নামায আদায় করালেন যখন ভোর বিদ্যুতের মত আলোকিত হল এবং যে সময় রোযাদারের উপর পানাহার হারাম হয়। তিনি (জিবরীল) দ্বিতীয় এবং পূর্ববর্তী দিন ঠিক যে সময় আসরের নামায আদায় করেছিলেন। অতঃপর আসরের নামায আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করালেন পূর্বের

দিনের সময়ে। অতঃপর 'ইশার নামায আদায় করালেন যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলে গেল এবং ফযরের নামায আদায় করালেন যখন যমিন আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর জিবরীল (আঃ) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হল আপনার পূর্ববর্তী নবীদের (নামাযের) ওয়াক্ত। নামাযের ওয়াক্ত এই দুই সীমার মাঝখানে। **১**

....

১, তিরমিজী, **১৪৯**— মিশকাত— (৫৮৩),

....

১. ফজরের ওয়াক্ত: ফজরের ওয়াক্ত সুবহে সাদেক হতে আরম্ভ করে উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময় থাকে।

২.যোহরের ওয়াক্ত: সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া মাত্রই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়।যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের ছায়া সেই জিনিসের সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জোহরের সময়

৩. আসরের ওয়াক্ত: আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন ছায়া দ্বিগুণ হয় তখন।অনেক আলেমের মতে যোহরের ওয়াক্ত শেষ হলেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সময় থাকে।

৪.মাগরিবের ওয়াক্ত:সূর্যাস্তের পর থেকেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং শেষ হয় পশ্চিমাকাশে লাল আভা বিলীন হওয়া পর্যন্ত।

৫. এশার ওয়াক্ত: মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হলেই এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময় থাকে;তবে অর্ধরাতের পরে এশার নামাজ পড়া মাকরূহ।

....

৭. সালাত বই থেকে

....

নামাজের মাকরূহ ও নিষিদ্ধ সময়

প্রত্যাক নামাজের ই সময় সীমা রয়েছে।তারপরও এমন কিছু সময় আছে যখন ফরজ, সুন্নত, নফল এবং কাযা নামাজ ও পড়া যাবে না।আবার কিছু সময় আছে যখন নামাজ আদায় করা অপছন্দনীয়।

নামাজের নিষিদ্ধ সময় ৩ টি। যথা:

1. সূর্যোদয়ের সময়,অথাৎ সূর্যের রক্তিম আভা ছেড়ে সাদা আলো ছড়ানোর পর্যায়ে উঁচু হওয়া পর্যন্ত।

2. সূর্যের মধ্যাকাশে অবস্থানের সময়ে, পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত।

3. সূর্যের হলুদ বর্ণ ধারণ করার সময়, সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে ঐদিনের আসর নামাজ এ হুকুমের ব্যতিক্রম।

উপরে উক্ত নিষিদ্ধ সময়ে জানাজার নামাজ, কাজা নামাজ কিংবা তেলাওয়াতের সেজদা কোনটাই বৈধ নয়। ১

নামাজের মাকরূহ সময়

1. ফজরের নামাজের পর সূর্য উদয় পর্যন্ত।

2. আসরের নামাজের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার নামাজ মাকরূহ।

3. সুবহে সাদেকের পর ফজরের ফরজ নামাজের পূর্বে দু'রাকাত সুন্নত ব্যতীত অন্য অন্য যেকোনো নামাজ পড়া মাকরুহ।

4. সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাজের পূর্বে যেকোনো নামাজ আদায় করা মাকরূহ। ২

....

১.আল ফিকহুল মুয়াসসার

২.আল ফিকহুল মুয়াসসার

....

নামাজের আহকাম

১.শরীর পবিত্র হওয়া।

২.কাপড় বা বস্ত্র পবিত্র হওয়া।

৩.নামাজের জায়গা পবিত্র হওয়া।

৪.সতর ঢেকে রাখা।

৫.কিবলামুখী হওয়া।

৬.ওয়াক্তমত নামাজ আদায় করা

৭.নামাজের নিয়্যত করা।

নামাজের আরকান

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা। অর্থাৎ, নামাযের নিয়ত করার সময় 'আল্লাহ আকবার' বলা।

২. কিয়াম করা ও অর্থাৎ, কোন অসুবিধা না থাকলে সাোজা হয়ে দাঁড়ানাো।

৩. কিরআত পাঠ করা ও পবিত্র কুরআন থেকে কমপক্ষে তিনটি ছাোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত পাঠ করতে হবে।

৪. রুকূ করা।

৫. দু'সাজদা করা।

৬ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ বিলম্ব করা।

....

সালাতের রোকন, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মাকরুহ ও সালাত ভঙ্গকারী বিষয় :

এখানে সালাতের বারোটি রোকন রয়েছে। এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানতে হবে। কারণ সালাতের রোকন ভঙ্গ হয়ে গেলে আবার সালাত আদায় করতে হবে।

নামাজের রোকনসমূহ:

নামাজের অনেকগুলো রোকন আছে যেগুলো আদায় করা ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না।

১. সক্ষম ব্যক্তির জন্য ফরয সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা:
অর্থাৎ-ফরয সালাত দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা অবস্থায় দাঁড়ানোর স্থানে দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরয।
প্রমাণ, আল্লাহ বলেন :

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. (سورة البقرة

তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে থাক।

২. তাকবীরে ইহরাম:

সালাতের প্রারম্ভে আল্লাহু আকবার বলবে। প্রমাণ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) .رواه الترمذي

রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সালাতের শুরু হল তাকবীর আর শেষ হল সালাম। (তিরমিযি:৩০৬)

৩. সুরা ফাতেহা পড়া:

ইমাম ও মুক্তাদি সকলের জন্য প্রতি রাকাআতে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

প্রমাণ : রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لا صلوة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب.) رواه البخاري

যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়েনা তার সালাত হয় না। (বুখারী:৭১৪)

৪. রুকু করা।

৫. রুকু হতে উঠা।

৬. প্রতি রাকাআতে দুইবার সেজদা করা।

৭. দুই সেজদার মাঝে বসা।

প্রমাণতআল্লাহর বাণী :

يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) سورة الحج

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা রুকু কর এবং সেজদা কর। (সুরা হজ : ৭৭)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. رواه البخاري

তারপর ভালভাবে রুকু কর। অত:পর রুকু হতে মাথা উঠাও এবং সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াও তারপর ভালভাবে সেজদা কর। অত:পর সেজদা হতে মাথা উঠাও এবং ভালভাবে বস। তারপর পুণরায় ভালভাবে সেজদা কর। (বুখারী:৭১৫)

মনে রাখতে হবে, সেজদা অবশ্যই সাতটি অঙ্গের উপর করতে হবেতকপাল-নাক, দুই কবজি, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের তালু।

৮. শেষ তাশাহুদ

৯. শেষ বৈঠক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

فإذا صلى أحدكم فليقل – أي أثناء جلوسه للتشهد الأخير

যখন সে সালাত পড়বে শেষ বৈঠকে বলবে:

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه البخاري

১০. সালাম

অর্থাৎ ডান দিকে বলবে السلام عليكم ورحمة الله এবং বাম দিকে বলবে السلام عليكم ورحمة الله প্রমাণ, রাসূল সা বলেন :

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . الترمذي

সালাতের শুরু হল তাকবীর আর শেষ হল সালাম। (তিরমিযি:৩০৬)

১১. সালাতে সকল রুকুনকে ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।

১২. সমস্ত রুকনগুলি ধারাবাহিকভাবে আদায় করা।

নামাজের ওয়াজিব

নামাজের মধ্যে রয়েছে ১৪টি ওয়াজিব কাজ। ওয়াজিব কাজ বলতে ঐ সব কাজকে বুঝায়, যার কোনো একটিও ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু আদায় করতে হয়। সিজদায়ে সাহু আদায় করতে ভুলে গেলে পুনরায় নামাজ পড়তে হয়। তাই নামাজের ওয়াজিবগুলো যথাযথ আদায় না করলে নামাজ হবে না। নামাজের ওয়াজিবগুলো তুলে ধরা হলো-০১. প্রত্যেক নামাজে সুরা ফাতিহা (আলহামদুলিল্লাহ) পড়া।০২. প্রত্যেক নামাজে সুরা ফাতিহার পর (কিরাত) সুরা মিলনো (কমপক্ষে তিন আয়াত অথবা তিন আয়াতের সমকক্ষ এক আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করা)।০৩. ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাআতকে কিরাতের জন্য নির্ধারিত করা।০৪. কিরাআত, রুকু, সিজদার মধ্যে ক্রমধারা বা তারতিব ঠিক রাখা।০৫. কাওমা করা অর্থাৎ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।০৬. জলসা করা অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।০৭. তাদিলে আরকান করা অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কাওমা, জলসায় কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা। যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যথাস্থানে পৌঁছে যায়।০৮. কাদায়ে ওলা অর্থাৎ তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাজে দুই রাকাআত পর আত্তাহিয়াতু পড়া বা সম-পরিমাণ সময় বসা।০৯. প্রথম ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়া।১০. জাহেরি নামাজে প্রথম দুই রাকাআত ইমামের জন্য উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া এবং সিররি নামাজের মধ্যে ইমাম ও একাকি নামাজির অনুচ্চ শব্দে কিরাআত পড়া। ১১. সালাম ফিরানো। অর্থাৎ ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলে নামাজ শেষ করা।১২. বিতরের নামাজের দোয়ায়ে কুনুত পড়ার জন্য অতিরিক্ত তাকবির বলা এবং দোয়ায়ে কুনুত পড়া।১৩. দুই ঈদের নামাজে ছয় ছয় তাকবির বলা।১৪. প্রত্যেক রাকাআতের ফরজ এবং ওয়াজিবগুলোর তারতিব (ধারাবাহিকতা) ঠিক রাখা।

আর রয়েছে সালাতের কিছু মুস্তাহাব কাজ। যে কাজগুলো করলে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই। আর সেগুলো বাদ পড়লে সিজদা সাহু দিতে হবে না।এই বিষয়গুলো আমাদের জানা প্রয়োজন। কারণ আমাদের অনেক সময় সালাতে ভুল হয়ে যায় এবং এর জন্য সিজদা সাহু দিতে হয়।

এরপর সালাতের নিষিদ্ধ এবং অপছন্দনীয় কিছু বিষয় আছে। অনেক সময় নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় জিনিসগুলোর জন্য আমাদের সালাতে সাওয়াব এর ঘাটতি হয়ে থাকে।
প্রথম হচ্ছে প্রয়োজন ছাড়া এদিক ওদিক তাকানো। দ্বিতীয় টা হচ্ছে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকানো। তৃতীয় টা হচ্ছে সিজদায় দুই বাহু মাটিতে বিছিয়ে রাখা।চতুর্থ হচ্ছে অনর্থক নড়াচড়া করা। অনেকে সালাতে দাঁড়িয়ে কাপড় ঠিক করে, আঙ্গুল ফোটায়। এই সমস্ত কাজই হচ্ছে মাকরুহ অপছন্দনীয়।পঞ্চম হচ্ছে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বা কারো যদি টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা যেন সেগুলো বন্ধ করে সালাত আদায় না করি। কারণ এতে আমাদের সালাতে মনোযোগ থাকবে না।ষষ্ঠ হচ্ছে সালাতে হাই তোলা একটি অপছন্দনীয় ব্যাপার। কারণ শয়তান প্রবেশ করে মুখের ভিতর দিয়ে এবং হাই উঠলে আমরা সালাতে সেটাকে সাধ্যমত চেষ্টা করব চেপে রাখার জন্য।এগুলো হচ্ছে অপছন্দনীয় বিষয় যা সালাতের মধ্যে হলে তা আমাদের সাওয়াব কমিয়ে দেয়।

সালাত ভঙ্গকারী বিষয়

এটা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে যেমন কথা বলা, সশব্দে হাসা। মুচকি হাসি আসতে পারে তাতে সালাত ভঙ্গ হবে না কিন্তু জোরে হাসলে সালাত ভঙ্গ হবে।
পানাহার করা। হয়তো দেখা গেল যে মুখের ভিতর খাবারের একটা টুকরো রয়ে গেল। আর সালাত পড়া অবস্থায় সেটা আমি চিবাচ্ছি। এই কাজটি কখনোই করবো না।

আওরাতের কোন অংশ উন্মুক্ত করা। সালাতে যে সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখতে হয় তাই আওরা। সে অঙ্গ গুলি যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে খুলে ফেলি তবে সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে তা বেশি হোক বা কম হোক। অনেক সময় আমাদের আওরা অনিচ্ছায় খুলে যায়। এক্ষেত্রে যদি তা অনেক সময় ধরে খোলা থাকে তবে সালাত ভঙ্গ হবে। আর যদি অল্প সময় খোলা থাকে তবে সালাত ভঙ্গ হবে না।

কিবলার দিক থেকে ঘুরে গেলে সালাত ভেঙে যাবে কারণ হচ্ছে সালাতের শর্তই হচ্ছে যে কিবলামুখী হতে হবে।তারপর ক্রমাগত অধিক পরিমাণে নড়াচড়া করা অর্থাৎ কেউ শুধু সারাক্ষণ সালাতে নড়াচড়া করছে সেটা তার সালাত কে ভেঙে ফেলবে।তবে জরুরি অবস্থায় কিন্তু সালাত ভঙ্গ হবে না। যেমন - সালাত রত অবস্থায় কেউ সাপ বা বিচ্ছুকে হত্যা করল তখন তো তাকে নড়তেই হচ্ছে।সে সময়টায় কিন্তু তার সালাত ভঙ্গ হবে না। আবার অনেক সময় এটা হতে পারে যে কেউ নৌকায় সালাত পড়ছে তখন কিন্তু একটু পরপর নৌকাটি দিক বদল করছে এবং নৌকা আরোহী তাকে কিন্তু সালাত রত অবস্থায় কিবলার দিক পরিবর্তিত করতে হচ্ছে সেটা করা জায়েজ আছে।
পবিত্রতা ভঙ্গ হয় কেননা পবিত্রতা সালাতের শর্ত। তাহলে কোনভাবে যদি আমাদের পবিত্রতা ভঙ্গ হয়ে যায় তবে আবারও আমাদেরকে সালাত আদায় করতে হবে।

নামাজে খুশু-খুযু

★ খুশু-খুযুর গুরুত্ব

ইবাদাতের মধ্যে স্থিরতা অবলম্বন করা হলো খুশু;অর্থাৎ অন্তর কে আল্লাহর তা'আলার প্রতি নিবিষ্ট করা।আর ইবাদাতটি একাগ্রতাসহকারে আদায় করাকে খুযু বলে।
খুশু-খুযুর দুটি অংশ রয়েছে-১. নামাযে অঙ্গ-প্রতঙ্গ স্থির রাখা।২.মনোযোগ ও একাগ্রতা রক্ষা করা। এই দুই বৈশিষ্ট্যের সাথে যে নামাজ আদায় করা হয় তাকে খুশু-খুযুযুক্ত নামাজ বলে।নামাজে খুশু-খুযু অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।খুশু-খুযুকে নামাজের প্রাণ বলা

হয়।কুরআন ও হাদিসে এ সম্পর্কে অনেক তাকিত দেওয়া হয়েছে।পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেছেন,

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ

অর্থঃঅবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে।১

الَّذِيۡنَ هُمۡ فِىۡ صَلَاتِہِمۡ خٰشِعُوۡنَ

অর্থঃযারা নিজেদের নামাযে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে।২

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা আল্লাহ সফলকাম মুমিনদের যে সর্বপ্রথম গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন -তারা হবে খুশু-খুযুপূর্ণ নামাজ আদায়কারী।নামাজে আল্লাহ তা'আলার সামনে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেনো কোনো অলসতা,গাফিলতি ও বেপরোয়া ভাবের কোনো চিহ্ন ও যেন না আসে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনেঃ

هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ

অর্থঃএটা একধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত হতে অংশ বিশেষ অংশ ছিনিয়ে নেয়।2

....

১,সূরা আল- মুমিনুল,আয়াত:১,২

২, সহীহ, বুখারী-৭৫১

নামাজ মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও যথাযথ মূল্যায়িত হওয়ার জন্য খুশু-খুজু অর্জন একান্তভাবে জরুরী।সালাফে সালেহীনরাও খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করতেন।

সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত এর এখানে ৬টি পয়েন্ট দেওয়া আছে।

১) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল।

২) কেয়ামতের দিন প্রথম সালাতের হিসাব হবে।

৩) সালাত পাপ কাজ থেকে রক্ষা করে।

৪) সালাত অন্তরের প্রশান্তি কারণ।

৫) সালাতের দ্বারা গুনাহ মাফ হয়, সওয়াব বৃদ্ধি হয়।

৬) সালাত জান্নাত লাভের কারণ।

প্রথম পয়েন্ট: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে সালাত। কেউ যখন শাহাদাত গ্রহণ করে মুসলিম হয় তখন তার জন্য সর্বপ্রথম যে আমল করতে হবে তা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। এটা বাধ্যতামূলক। আর সালাত হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামের দ্বিতীয় রোকন।

দ্বিতীয় পয়েন্ট: কেয়ামতের দিন প্রথম সালাতের হিসাব হবে। কেয়ামতের দিন বিচার যে হবে সেদিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সেটি ঠিক থাকে তবে সে সফল হয়ে যাবে আর যদি সালাতের ক্ষেত্রে সমস্যা থাকে, ঘাটতি থাকে তখন সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অর্থাৎ তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।যদি কেউ সালাত আদায়কারী হয় তখন দেখা হবে তার ফরজ সালাতে ঘাটতি আছে কিনা? তখন সে বান্দার যদি নফল সালাত থাকে সেটা দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে এবং তারপর সকলের অন্যান্য আমলের হিসাব নেওয়া হবে যার সালাতের হিসাব ঠিক থাকবে তার জন্য অন্য সকল হিসাব সহজ হয়ে যাবে।

তৃতীয় পয়েন্ট: সালাত পাপ কাজ থেকে রক্ষা করে। যেকোনো অন্যায় ও অশ্লীল কাজ ও পাপাচার থেকে সালাত মানুষকে দূরে রাখে। কোরআনের সূরা আল-আনকাবুত ৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

চতুর্থ পয়েন্ট: তাছাড়া সালাত হচ্ছে অন্তরের প্রশান্তির কারণ। সেটিও আমরা একটি হাদিস থেকে জানতে পারি। যেখানে রাসূল (সা.) বলেছেন যে, "হে বিলাল সালাতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে অর্থাৎ আযান দিয়ে আমাদেরকে প্রশান্তি দাও।" এছাড়া আরো অনেক হাদীস রয়েছে এ সম্পর্কে।

পঞ্চম পয়েন্ট: সালাতের দ্বারা গুনাহ মাফ হয়,সওয়াব বৃদ্ধি হয়। সালাত ফরজ কাজ।এই ফরজ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ পালন করা হয়। যেজন্য আল্লাহ সওয়াব বাড়িয়ে দেন। আর একটি হাদীসে এসেছে যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মাধ্যমে এর মাঝখানের সগিরা গুনাহ গুলো মাফ হয়ে যায়। এই হাদিসটি হচ্ছে বুখারী ও মুসলিমের হাদীস।যে হাদিসটির কথা প্রথমে বলা হলো সেটি বুখারী মুসলিমের হাদীস কিন্তু সেটি মাঝখানের গুনাহ মাফ করে দেয় সে কথা বলা হয়নি সেটিতে বলা হয়েছে যে, সালাতের মাধ্যমে মানুষ গুনাহ থেকে মুক্ত হয় আর মুসলিম এর একটি হাদীসে রয়েছে যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআ থেকে আরেক জুমা, এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান এর মধ্যবর্তী পাপ কাজের কাফফারা হয়ে যায় যদি কেউ কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কবিরা গুনাহ হচ্ছে বড় গুনাহ। যেগুলো তওবা ছাড়া মাফ হয় না, আর সগিরা গুনাহ হচ্ছে ছোট গুনাহ। ছোট গুনাহগুলো আল্লাহ ভালো কাজের মাধ্যমে মাফ করে দেন। সালাত একটি ভালো কাজ এবং ফরজ কাজ। এর মাধ্যমে আমাদের অনেক সগিরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৬ষ্ঠ পয়েন্ট: সালাত হচ্ছে জান্নাত লাভের কারণ। যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হেফাজত করা অর্থাৎ সঠিক সময়ে, সঠিক নিয়মে, ধীরে সুস্থে আদায় করে এবং আল্লাহ সন্তুষ্টির

উদ্দেশ্যে আদায় করে তার জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এটি আহমদ আবু দাউদ অন্যান্য হাদীস থেকে পাওয়া যায়।

....

৮. সালাত বই থেকে

....

সালাত বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত

সালাত তিনটি কারণে ফরজ হয়।

১) মুসলিম হওয়া। কারণ অমুসলিম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তার কোনো আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না ।

২) পূর্ণবয়স্ক বা বালেগ হওয়া, যে নাবালক তার উপর সালাত ফরজ নয়।

৩) মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে, যে উন্মাদ বা মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি তার উপর সালাত ফরজ নয়।

এখান থেকে একটি মাসআলা আমরা জানতে পারি যে, কোনো অমুসলিম যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাকে অতীতের সালাত কাযা করতে হবে না বা আবার আদায় করতে হবে না। তার আগের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আগে যে সমস্ত কাজ ফরজ হতে পারতো তার জন্য, সে সমস্ত কিছু মাফ করে দেওয়া হবে। আরো একটি মাসআলা আমরা জানতে পারি সেটা হচ্ছে যে, কেউ ঘুমিয়ে গেলে না জায়গা পর্যন্ত, কোনো শিশু বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এবং পাগল সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর সালাত ফরজ নয় এবং তাদের উপর কাযা পড়াটাও আবশ্যকীয় নয়। ঘুমন্ত ব্যক্তির ব্যাপারটা বুঝতে

হবে যে, অনেক সময় দেখা যায় যে, কেউ ঘুম থেকে উঠতে পারল না। এই ব্যাপারটি এমন হবে যে ঘুম থেকে উঠার জন্য সে সব ধরনের চেষ্টা করবে অর্থাৎ অন্যকে বলে রাখবে, সে এমন সময় ঘুমাবে যে, সে সালাতের সময় উঠতে পারে বা এলার্ম দিয়ে রাখবে। এরপরেও যদি সে উঠতে না পারে তাহলে ওঠা মাত্রই সেই সালাতটি তাকে প্রথমে আদায় করে ফেলতে হবে। এই বিষয়টি প্রায়ই ঘটে। তাই এই বিষয়টি আমরা সবাই খেয়াল রাখব। অনেকে অসুস্থতার কারণেও হয়তো দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। বিশেষ করে ফজরের সময়, এই ঘটনাটি ঘটে থাকে। উঠার পর তার প্রথম কাজই হচ্ছে সে সেই সালাত আদায় করে নেবে। কারণ সালাতের ব্যাপারে কোন ধরনের ওজন নেই। এটা অবশ্যই পালন করতে হবে, কারণ এটা ফরজ। তারপর আরেকটি মাসাআলা আমরা জানতে পারি সেটা হচ্ছে কেউ যদি খুব বেশি বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং তার বোধশক্তি লোপ পেয়ে যায় তার জন্য সালাত বাধ্যতামূলক নয়। যদি তার কিছুটা বোধশক্তি থাকে তাহলে পরিবারের অন্যরা তাকে বলে দিবে যে, সালাত কীভাবে আদায় করতে হবে? কখন কোন জিনিসটা সালাতে পড়তে হবে। এভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বৃদ্ধ ব্যক্তির সালাত আদায় করতে সাহায্য করবেন। এতে সওয়াব পাবে তারা। আর যে অজ্ঞান বা অচেতন হয়ে গেছে তার ওপরও কিন্তু সালাত ফরজ নয় এবং তাকে পরবর্তীতে সেই সালাত আদায় করতে হবে না। এরপর যে বিষয়টি আমরা জানবো তা হচ্ছে সালাত ওয়াক্তের বাইরে নেওয়া বৈধ নয়। অর্থাৎ আমাদেরকে সময়মত সালাত আদায় করতে হবে। যখন সালাতের সময় শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু সেটা আমাদের জন্য হালাল হচ্ছে না।

আল্লাহ সূরা নিসার 103 নাম্বার আয়াতে বলেছেন, "নিশ্চয়ই মুমিনদের উপর সালাত যথাসময়ে আদায় করা বাধ্যতামূলক। এই বিধান অসুস্থ, মুসাফির, যুদ্ধরত, কর্মরত যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। ওয়াক্তের ভিতরে সালাত আদায় করতে হবে। এমনকি যদি কেউ পরনের কাপড় না পায় সে কাপড় ছাড়া অবস্থাতেই সালাত আদায় করবে। কেউ যদি শত্রুর হাত থেকে পালাতে থাকে এবংওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার

উপক্রম হয় সে অবস্থায় তাকে সালাত আদায় করতে হবে ইশারা করা হলেও। কিবলামুখী হতে না পারলেও এবং রুকু সিজদা করতে না পারলেও। অনেক সময় অসুস্থতার সময় এই জিনিসটা করা যায় না। কিন্তু তখনও সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করে নিতে হবে।

একইভাবে পানি পাওয়া না গেলে কী করতে হবে? তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে হবে। পানির আশায় বসে থেকে কিন্তু সালাতের সময় পার করে দেওয়া যাবে না। আর কেউ যখন সালাত ছেড়ে দিবে তখন তার জন্য বিধান কী হবে? এটাও এটা তিন রকম হতে পারে। যেমন: কেউ যদি সালাত ফরজ হওয়াকে একেবারে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের বা বিশ্বাসী হয়ে যাবে। কেউ যদি সালাত ফরজ হওয়াকে স্বীকার করে কিন্তু মোটেও সালাত আদায় না করে তবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কারণ রাসূল (স.) মুসলিমের হাদিসে বলেছেন, "নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে রয়েছে সালাত ছেড়ে দেওয়া। তাছাড়া আরও একটি হাদীস রয়েছে যা তিরমিজিতে আছে যে, সাহাবীরা সালাত ছাড়া আর কোনো আমল পরিত্যাগ করাকে কুফর মনে করতেন না। আর তিন নাম্বার বিধান যেটা, সেটা হচ্ছে কেউ হয়তো কোনো কোনো সালাত আদায় করে আবার কোনোটা আদায় করে না, সেক্ষেত্রে সে খুব বড় গুনাহগার হবে কিন্তু তাকে মুসলিম হিসেবে তা স্বীকার করতে হবে।

....

সালাতের পূর্ববর্তী আদব

সালাত আদায় করতে গেলে এর পূর্বে আমাদের আদব বা আচার-আচরণ কী হওয়া উচিত? এখানে **১১**টি পয়েন্ট আছে তা আমাদের জানতে হবে যেহেতু সবাই সালাত আদায় করে থাকি।ছেলেরা যে শুধু মসজিদে যায় তা কিন্তু নয় মেয়েরাও যায় মসজিদে তাই সালাতের এ বিষয়গুলো সবার জানা উচিত।

প্রথম আদব তা হচ্ছে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যের সাথে সালাতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া।অর্থাৎ আমরা তাড়াহুড়া করব না। ধীরে- স্থির ভাবে ওযু করে ইকামত হলে সালাতের দিকে হেঁটে যাবো।

অর্থাৎ যে মসজিদে যাবে সে মসজিদের দিকে হেঁটে যাবে আর আমরা যারা মসজিদে যাব না তারা ঘরে সালাত এর প্রস্তুতি নিব। তাড়াহুড়া না করে মসজিদে যাব এবং যাওয়ার পর যেটুকু সালাত পাবো সেখান থেকে আদায় করব। যদি দুই বা এক রাকাত বাদ হয়ে যায় তবে তা জামাত শেষে বা জামাত শেষ হওয়ার পর আদায় করে নেব। এখানে জামাতে সালাত আদায় করার ব্যাপারে বলা হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ধীর-স্থিরভাবে সালাতের প্রস্তুতি নিতে হবে।

দুই নাম্বার আদব হচ্ছে হাতের আঙ্গুলগুলোকে পরস্পরের ভেতর প্রবেশ না করানো।অজু করে মসজিদে যাওয়ার সময় দুই হাতের আঙ্গুলগুলোকে একটির ভেতর আরেকটিকে প্রবেশ করাতে নিষেধ করা হয়েছে যা এসেছে সহি হাদিসে।

তিন নাম্বার আদব হচ্ছে ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া পড়া। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আমরা দোয়া পড়ে বের হব। কারণ এটা পড়লে তখন শয়তান আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

চার নাম্বার আদব হচ্ছে সালাত এর দিকে অগ্রসর হওয়ার দোয়া পড়া।এই দোয়াতে আল্লাহর কাছে নূর চাওয়া হয়েছে। অন্তর, কানে, জিব্বা, সামনে, পেছনে নূর চাওয়া হয়েছে। এই নূর চাওয়া মানে আলো চাওয়া। যে আলো আমাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কে দুনিয়া এবং আখেরাতেও আলোকিত করবে।এবং এই আলোকিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে আমরা জ্ঞান অর্জন করব এবং সেই অনুযায়ী আমাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এইভাবে আলোকিত হবে ।আমরা সর্বদা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজই করব, কথাই বলব এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তবে তা আখেরাতে আমাদের জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে যাবে।

পাঁচ নাম্বার আদব হচ্ছে ইকামত শুনলে তাড়াহুড়া না করা।সালাত আদায় না করা। সালাত আদায়ের আগে ইকামত দেওয়া হয়। ইকামত হচ্ছে ফরজ সালাত শুরুর ঘোষণা। ইকামত শুনলে তাড়াহুড়া না করে ধীরে সুস্থে আমাদেরকে মসজিদের দিকে যেতে বলা হয়েছে।যদি দুই বা এক রাকাত সালাত ছুটে যায় তবে জামাতে সালাত আদায় শেষ করে সে ছুটে যাওয়া সালাত আমাদেরকে আদায় করতে হবে।

ছয় নাম্বার আদব হচ্ছে ইকামত শুনলে নফল না সুন্নত সালাত শুরু না করা। ইকামতের আগে এবং আজানের পরে কিন্তু কেউ চাইলে নফল সালাত আদায় করতে পারে বা কারো যদি সুন্নাত সালাত বাকি থাকে তবে সে সেই সুন্নাত সালাত সলাত আদায় করে নিতে পারে। কিন্তু ইকামত শুরু হয়ে গেলে সে সেটা করবে না এবং সে তখন ফরজ সালাতেই যোগ দেবে। এটা হাদিসে এসেছে।

সাত নাম্বার আদব হচ্ছে মসজিদে প্রবেশ ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার আদব।মসজিদে আমরা ডান পা দিয়ে ঢুকবো এবং বাম পা দিয়ে বের হব। মসজিদে ঢোকার সময় আমরা মসজিদে প্রবেশের দোয়া টি পড়ে নেব এবং আমরা যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে যাব তখন আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া পড়ে নেব।

আট নাম্বার আদব হচ্ছে মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' আদায় করা।মসজিদে আমরা যখনই প্রবেশ করব তখন আমরা এই দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে নেব।সেটা না করে আমরা বসব না এবং আমরা যদি দেখি যে ফরজ সালাত শুরু হয়ে গেছে তবে আমরা সালাতের কাতারে দাঁড়িয়ে যাব। সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে এই দুই রাকাত সালাত আদায় করতে হচ্ছে না। আবার জুম্মার দিন কিন্তু মসজিদে খুতবা শুরু হয়ে গেলেও আমরা যদি দেরিতে প্রবেশ করি তবে আগে দুই রাকাত সালাত আদায় করব তারপর বসে খুতবা শুনবো।

নয় নাম্বার আদব হচ্ছে সালাতের জন্য অপেক্ষা। আমরা যখন কেউ সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকব তখন কিন্তু আমরা এর জন্য সাওয়াব পেতে থাকবো।

দশ নাম্বার আদব হচ্ছে জামাতের কাতার সোজা ও সুষম করা।কারণ এটা বাধ্যতামূলক এবং সহীহ হাদীসে এসেছে যে আমরা যেন আমাদের কাতার গুলো কে সোজা করে নেই কারণ এটা পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। কাতার যদি আঁকাবাঁকা হয় তবে আল্লাহ আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন এবং যেটা করতে হবে যে দুজনের মধ্যে আমরা কখনও ফাঁক রাখবো না। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং পায়ে পা মিলিয়ে আমরা দাঁড়াবো। ফাঁক বন্ধ করতে বলা হয়েছে কারণে ফাঁকা জায়গা দিয়ে শয়তান ছোট ছোট ভেড়ার আকারে আমাদের মাঝে প্রবেশ করে এবং আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

এগারো নাম্বার আদব হচ্ছে সুতরা।ইমামের সাথে হোক অথবা একাকী সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে হোক না কেন তার সিজদার জায়গায় একটু আগে একটা জিনিস রেখে সালাত আদায় করতে হয় এটিকে সুতরা বলা হয়।হাদিসে বলা হচ্ছে যে একটি তীর দিয়ে হলেও যেন সালাতে সুতরার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।অর্থাৎ একটি তীর থাকলেও

সেটিকে আমরা সামনে পুঁতে রাখব। একটি চেয়ার বা সামনে যদি দেয়াল থাকে বা যেকোনো কিছুই সুতরার অংশ হতে পারে।

তাহলে এই এগারটি হচ্ছে সালাতের পূর্ববর্তী আদব। এটি মূলত জামাতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে বলা হচ্ছে তবে এটি জানা আমাদের সবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

....

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নামাযের নির্দেশ

কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও দিয়েছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নামাযও ওসব বিষয়ের অন্যতম, যার বিধান আল্লাহ অন্যান্য নবীদেরকেও দান করেছেন (যদিও নামাযের সংখ্যা ও বিস্তারিত পদ্ধতি এক রকম ছিল না)।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ., ইসহাক আ., ইয়াকুব আ.-এর আলোচনা করে বলেন-

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা, যারা আমার নির্দেশে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত। আমি ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম সৎকর্ম করতে, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত আদায় করতে। আর তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল।-সূরা আম্বিয়া (২১) : ৭৩

মারইয়াম আলাইহাস সালাম যখন সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিয়ে নিজ স¤প্রদায়ের কাছে এলেন তখন তারা তাঁর প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করতে লাগল। তিনি ইশারায় তাদের জানালেন তারা যেন শিশুটিকেই জিজ্ঞাসা করে, কীভাবে তার জন্ম হয়েছে। তখন তারা বলল, আমরা দোলনার শিশুর সাথে কীভাবে কথা বলব? এমন সময় আল্লাহ শিশুটির যবান খুলে দিলেন। দোলনার শিশু ঈসা মাসীহ্ বলতে শুরু করলেন-

اِنِّیْ عَبْدُ اللهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلٰمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُّ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا.

আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন আর তিনি আমাকে করেছেন বরকতময় আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি। এবং আমাকে করেছেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী। আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগা। আর আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব।-সূরা মারইয়াম (১৯) : ৩০-৩৩

এখান থেকে এটা যেমন জানা গেল যে, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল, তেমনি এও বোঝা গেল যে, নামায অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই তো দোলনার শিশুর যবান দিয়ে আল্লাহ যে কটি কথা বলিয়েছেন তাতে নামায স্থান পেয়েছে। ঈসা মাসীহের এ বাণী থেকে আরো জানা গেল, যতদিন হায়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামায পড়তে হবে।

মূসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান থেকে সপরিবারে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলেন। পথে আগুন দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এলেন। আসলে এটা জাগতিক আগুন ছিল না। এটা ছিল আল্লাহর নূর। কাছে আসার পর আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন-

اِنِّیۡۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخۡلَعۡ نَعۡلَیۡكَ اِنَّكَ بِالۡوَادِ الۡمُقَدَّسِ طُوًی وَاَنَا اخۡتَرۡتُكَ فَاسۡتَمِعۡ لِمَا یُوۡحٰی اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكۡرِیۡ.

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক। সুতরাং তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা তুমি পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে তোমাকে যা বলা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোন। নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর।-সূরা ত্বহা (২০) : ১২-১৪

আয়াতের শৈলী থেকে বোঝা যায়, এখানেই মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওত দান করা হয়। তো নবুওতের সূচনাতেই তাঁকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও নামায কায়েমের আদেশ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোত্তম ইবাদত। আয়াতটি থেকে আরো বোঝা যায়, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। হাঁ, নামায আগাগোড়া আল্লাহর যিকির[১] এবং এতে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। এটা নামাযের অনন্য বৈশিষ্ট্য। নামায ছাড়া অন্য কোনো বিধান এমন নেই, যা আদ্যোপান্ত আল্লাহর যিকির এবং যেখানে যিকির পরিপন্থী কিছু করা নিষেধ। শুধু তাই নয়; নামাযে রয়েছে বিভিন্ন অবস্থার যিকির- দাঁড়িয়ে যিকির, বসে যিকির, মাথা ঝুঁকিয়ে যিকির, মাটিতে লুটিয়ে যিকির। আল্লাহর বড়ত্বের যিকির, গৌরবের যিকির, পবিত্রতার যিকির, হামদ ও ছানার যিকির, প্রার্থনা ও নিবেদনের যিকির...।

আমাদের উচিত যিকিরপূর্ণ এ ইবাদতটি মহব্বত ও মনোযোগের সাথে আদায় করা; অলসতা ও উদাসীনতার সাথে নয়। যিকিরের সঙ্গে কি উদাসীনতা মানায়?

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরে ঘর-বাড়ি কর এবং তোমাদের ঘরসমূহকে নামাযের স্থান বানাও এবং নামায কায়েম কর আর মুমিনদের সুসংবাদ দাও।-সূরা ইউনুস (১০) : ৮৭

এখান থেকে জানা গেল, মূসা আ. ও হারূন আ.-সহ তাঁদের গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি নামাযের নির্দেশ ছিল। আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নামায আদায় করতে হবে। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। প্রতিকূলতা দূর হবে।

কতিপয় তাফসীরকার লিখেছেন, এখানে মূসা আ. ও হারূন আ.-কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এটা তখনকার কথা যখন বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল এবং ইবাদতখানায় নামায আদায়ে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তখন তাদেরকে নামায তরক না করে ঘরেই আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নবীদের উপর যখন নামাযের বিধান ছিল তো তাঁদের উম্মতেরা অবশ্যই এর আওতাভুক্ত ছিল। বিশেষত সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে নামাযের বিধান দেওয়ার বিষয়টি কুরআন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ اَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۚ وَقَالَ اللهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে আমি বারজন নেতা নির্ধারিত করেছিলাম। আর আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমূহ মোচন করব এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আর এর পরও তোমাদের মধ্যে যে কুফর অবলম্বন করবে, নিশ্চয় সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে।-সূরা মায়েদা (৫) : ১২

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাযের বিধান ছিল। সেইসঙ্গে এটাও জানা গেল যে, নামাযসহ উপরিউক্ত আমলগুলো করলে আল্লাহর সঙ্গ লাভ হবে। গোনাহ মাফ করা হবে এবং জান্নাত দান করা হবে।

বনী ইসরাঈলকে নামাযের আদেশ করা সম্পর্কিত আরো আয়াতের জন্য দেখুন, সূরা বাকারা ৮৩; সূরা বাইয়িনা ৫

....

দুনিয়া ও আখিরাতের আলোকে সালাতের গুরুত্ব

দুনিয়া ও আখিরাতে পরকালে সালাতের অনেক উপকারিতা রয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপে কতিপয় উল্লেখ করা হলো:

১। সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।” (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

২। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎ সালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে সালাতের হিফাযত করল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।” (ইতোপূর্বে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)

৩। সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب﴾ [العلق: ١٩]

“আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।” [সূরা আল-‘আলাক, আয়াত: ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো‘আ কর।” (সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ)

সালাতই হচ্ছে আপনার ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। অতএব, আপনি যদি চান তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে (সালাতের মাধ্যমে) বেশি-বেশি সাজদাহ ও রুকুর মাধ্যমে এ সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে বেশি-বেশি দো‘আ করার ওসীয়ত করেছেন।

৪। সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফ্ফারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফ্ফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।” (সহীহ মুসলিম)

উক্ত হাদীসের শেষ অংশের দিকে লক্ষ্য করুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে” কেননা কবীরা গুনাহ খাঁটি ও আন্তরিক তাওবা ব্যতীত মাফ হবে না।

৫। সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, "পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা"। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]

"জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।" [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: ١٤]

"আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।" (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।” (সুনান নাসাঈ)

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: ١٢٤]

“যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।” [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাবো যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রনায় ভুগে।

৭। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ [البقرة: ٤٥]

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।" (মুসনাদে আহমদ) সাবেত রহ. বলেন, "নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।" (তাফসীর ইবন কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢]

"নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে।" (মুসনাদ আহমদ)

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮। সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢﴾ [المؤمنون: ١، ٢]

"অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।" [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২] আয়াত:ল-'হ্কাল ও পরকালের সফলতা

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥﴾ [الاعلا: ١٤، ١٥]

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" [সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৪-১৫]

আয়াতে উল্লিখিত "ফালাহ" শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

৯। সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢﴾ [طه: ١٣٢]

“এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২]

ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, “অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।”

১০। সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা: সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ﴾ [العنكبوت: ٤٥]

“তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৫]

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরই ওসীয়ত করেন এবং বলেন, “যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরের হয় তখন তাদেরকে সালাতের আদেশ কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে সালাতের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও”। (সুনান আবু দাউদ)

১১। সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعٗا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ٢٣﴾ [المعارج[١٩، ٢٣ :

“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।” [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

১২। সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ«

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।” (সহীহ মুসলিম)

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]

“আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।

....
৯.সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত বই থেকে
....

কুরআন ও হাদিসের আলোকে নামাজের ফজিলত

দুনিয়া এবং পরকালে সালাতের উপকারিতা অনেক,আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সূরা নূরে বলেছেন-

وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ

অর্থঃআর তোমরা সালাত কায়েম কর,যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর,যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।১(আল-বায়ান)

সালাত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَ اسۡجُدۡ وَ اقۡتَرِب

অর্থঃআর সিজদাহ্ কর এবং (আল্লাহ) নৈকট্য লাভ কর।২

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত;রাসূল(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন-

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء

অর্থ:বান্দা সাজদাহর সময়ে মহান আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। কাজেই এ সময় তোমরা অধিক পরিমাণে দু'আ পাঠ করবে।৩

সালাতের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি আসে,

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّکَ یَضِیْقُ صَدْرُکَ بِمَا یَقُوْلُوْنَ.فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِّنَ السّٰجِدِیْنَ

অর্থ:আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়।সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।(আল-বায়ান)৪

....

১,সূরা আন-নূর,আয়াত:৫৬

২,সূরা আল-আলাক, আয়াত:১৯

৩,সহীহ,আবু দাউদ-৮৭৫,মুসলিম-১১১১,মিশকাত-৮৯৪

৪,সূরা আল- হিজর,আয়াত:৯৭-৯৮

আমাদের নবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মানুষদের দ্বীনের দাওয়াত দিতেন তখন কাফের-মুসরিকরা নানা ভাবে কষ্ট দিতো।এতে নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানসিকভাবে ভেঙে পরতেন।তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন নবীজি(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে প্রশান্তি লাভের উপায় হিসেবে উক্ত আয়াতে তাসবিহ্ পাঠ করতে এবং সালাতে মসগুল হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

সালাতের মাধ্যমে রুজিতে বরকত আসে;

وَ اۡمُرۡ اَهۡلَکَ بِالصَّلٰوۃِ وَ اصۡطَبِرۡ عَلَیۡهَا ؕ لَا نَسۡـَٔلُکَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُکَ ؕ وَ الۡعَاقِبَۃُ لِلتَّقۡوٰی

অর্থঃআর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক।আমি তোমার কাছে কোন

রিযক চাই না।আমিই তোমাকে রিযক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।(আল-বায়ান)১

এই আদেশ নবী (সাঃ)-এর সাথে তাঁর সমস্ত উম্মতের জন্য। অর্থাৎ, মুসলিমদের জন্য জরুরী যে, তাঁরা নিজেদের নামাযের প্রতি যত্নবান হবে এবং পরিবারের লোকেদেরকেও নামাযের জন্য তাকীদ করবে।আর বান্দারা যখন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে,তখন তার রুযী-রোজগারের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দেন।

(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

সালাত জান্নাত লাভের উপায়;

أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُم

অর্থঃআবু উমামা আল বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত করো।

....

১.সূরা ত্ব-হা,আয়াত:১৩২;

....

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, (রমাযান) মাসের রোযা রাখো, সম্পদের যাকাত আদায় করো এবং তোমাদের আমীরের আনুগত্য করো; তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।১

সালাত কায়েমকারীদের জন্য সুসংবাদ ;

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَ لَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ

যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে,নামায কায়িম করে এবং যাকাত আদায় করে,তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সওয়াব নির্ধারিত আছে।তাদের কোন ভয় নেই,তারা চিন্তিতও না।(তাইসিরুল)২

সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন প্রশান্তি;আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ تَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ

অর্থঃ‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ,আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়’।(আল-বায়ান)৩

অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ বা যিকরের অর্থ তাঁর তওহীদের (একত্ববাদের) বর্ণনা,যার দ্বারা মুশরিকদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়।অথবা যিকর অর্থ তাঁর ইবাদত,কুরআন তিলাঅত, নফল ইবাদত এবং দু‘আ ও মুনাজাত;যা ঈমানদারদের মনের খোরাক।অথবা তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করা;যা ব্যতিরেকে ঈমানদার ও পরহেযগারগণ অস্থির থাকেন।(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

আর সম্পূর্ণ সালাতেই আল্লাহর যিকির।

....

১.সহীহ,তিরমিজি -৬১৬;মুসনাদে আহমদ-২২২১৫।

২,সূরা আল-বাকারা,আয়াত:২৭৭

৩,সূরা আর-রাদ,আয়ায়ত-২৮

জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত

“জামা’আত”শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো জিনিসের আধিক্য। অর্থাৎ কিছু মানুষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হওয়াকে “জামা’আত” বলে।তবে শরী'আতের পরিভাষায় “জামা’আত”বলতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করাকে বুঝায়।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মুসলিম উম্মাহ্’র জন্য ফরজ করে দিয়েছেন এবং মসজিদে গিয়ে জামা'আত আদায় করতে বলেছেন।

আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআন মজিদে বলেন,

وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ارۡکَعُوۡا مَعَ الرّٰکِعِیۡنَ۝

অর্থঃতোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।১

এখানে রুকুকারীদের সাথে রুকু করো শব্দদ্বয় দ্বারা জামা'আতে সালাত আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে।(তাফসিরে জাকারিয়া)

জামা’আতে সালাত আদায়ে সোওয়াব বেশি;

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

আল্লাহর রসূল(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃজামা’আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী।২

আবূ সা'ঈদ(রাঃ) থেকে বর্ণিত,

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

....

১. সূরা বাকারা,আয়াত:৪৩

২,সহীহ, বুখারী-৬৪৫।

অর্থঃতিনি আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন,একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত পঁচিশগুন বেশী।১

জামা'আতে যত দূর থেকে আসবে তত সোওয়াব বেশি;

আবূ মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَام ُ ".

অর্থঃনবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ(মসজিদ হতে) যে যত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে, তার তত অধিক পুণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার পুণ্য সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।

মসজিদে গমনকারী লোক আল্লাহর জিম্মায় থাকেন;

আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَة كلهم ضَامِن على الله عز وَجل رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِن على الله حَتَّى يتوفاه فيدخله الْجنَّة أَو يردهُ بِمَا نَالَ من أجرأوغنيمة وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله حَتَّى يتوفاه فيدخله الْجنَّة أَو يردهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله ِ.

অর্থঃরসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃতিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে।(১)যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হয়েছে সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে,যে পর্যন্ত আল্লাহ তাকে উঠিয়ে না নেন এবং জান্নাতে প্রবেশ না

করান। অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন,যে সাওয়াব বা যে গনীমাতের মাল সে যুদ্ধে লাভ করেছে তার সাথে।(২)যে ব্যক্তি মসজিদে গমন করেছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে এবং (৩)যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করেছে, সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে।২

১.সহীহ, বুখারী-৬৪৬।

২, সহীহ,মিশকাত-৭২৭,আবূ দাঊদ-২৪৯৪,আত্ তারগীব-৩২১।

মসজিদ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় জায়গা;

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَاد إِلَى الله أسواقها

অর্থঃআবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন,রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃআল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মাসজিদই হলো সবচেয়ে প্রিয়,আর বাজার সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান।

অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীকে নূর দেওয়া হবে;

বুরাইদা আল-আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত;তিনি বলেন,

عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَة ِ " .

অর্থঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যারা অন্ধকার পার হয়ে মসজিদে যায় তাদেরকে কিয়ামাতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুখবর দাও।

•জামা’আতে সালাত আদায়কারী হাশরের দিনে আল্লাহর ছায়ায় স্থান পাবে;

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত

তিনি বলেন,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّه يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّه وَرَجُلٌ قَلْبُه مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّىْ أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّق بِصَدَقَةٍ فأَخْفى حَتّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِينُه. مُتَّفَقٌ عَلَيْه

অর্থঃনবী(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন : সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তা’আলা সেই দিন (ক্বিয়ামাতের দিন) তাঁর ছায়ার নীচে আশ্রয় দিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না :

....

১.সহীহ্,

২,সহীহ্,তিরমিজি-২২৩, আবু দাউদ -৫৬১

১.ন্যায়পরায়ণ শাসক।

২.সেই যুবক যে যৌবন বয়স আল্লাহর ‘ইবাদাতে কাটিয়েছে।

৩.যে ব্যাক্তি মাসজিদ থেকে বের হয়ে এসে আবার সেখানে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মাসজিদেই তার মন পড়ে থাকে।

৪.সেই দুই ব্যাক্তি যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালবাসে। যদি তারা একত্রিত হয় আল্লাহর জন্য হয়, আর যদি পৃথক হয় তাও আল্লাহর জন্যই হয়।

৫.সে ব্যাক্তি যে একাকী অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করে আর আল্লাহর ভয়ে তার দু’চোখ দিয়ে আশ্রু ঝরে।

৬.যে ব্যাক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী যুবতী কু-কাজ করার জন্য আহবান জানায়। এর উত্তরে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

৭.সেই ব্যাক্তি যে আল্লাহর পথে গোপনে দান করে।যার বাম হাতও বলতে পারে না যে, তার ডান হাতে কী খরচ করেছে।১

....

১.সহীহ:বুখারী-৬৬০,মুসলিম-১০৩১,নাসায়ী-৫৩৮০,তিরমিযী-২৩৯১, আহমাদ-৯৬৬৫,মিশকাত-৭০১

ঐচ্ছিক সালাত (নফল সালাত)

ঐচ্ছিক সালাতকে নফল সালাত কেন বলা হচ্ছে এর কারণ আমাদের কিন্তু দিনে ১৭রাকাত সালাত আদায় ফরজ। এ ১৭ রাকাত হচ্ছে ফজরের দুই রাকাত ফরজ সালাত, যোহরের চার রাকাত ফরজ সালাত, আসরের চার রাকাত ফরজ সালাত, মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ সালাত, এশার চার রাকাত ফরজ সালাত।এর বাইরে যত রাকাত সালাত রয়েছে তা নফল বা ঐচ্ছিক। সেটা আমরা নিজেদের ইচ্ছায় পড়ছি। আমাদের দেশে দুটি প্রথা প্রচলিত আছে। একটি হচ্ছে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও অপরটি হচ্ছে সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা।যে সমস্ত নফল সালাত রাসুল (সা:) মোটামুটি নিয়মিত আদায় করতেন সে গুলোকে বলা হয় সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর যে সমস্ত সালাতে রাসুল (সা:) মাঝে মাঝে আদায় করতেন সে গুলোকে বলা হয় সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা।ফরজ সালাত ছাড়া বাকি সব সালাতই নফল সালাত। নফল সালাতের ফজিলত ও উপকারিতা রয়েছে। তা হচ্ছে নফল সালাতের মাধ্যমে আমরা বেশি বেশি সওয়াব পেতে পারি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি।

ফরজ সালাতে আমাদের নানা ধরনের ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। এই নফল সালাতের মাধ্যমে আমাদের সেই ভুল ত্রুটি গুলো পূরণ হয়ে যায়। ইনশাল্লাহ আমাদের যতটুকু যার পক্ষে সম্ভব হয় আমরা সেই নফল সালাত গুলো আদায় করব এবং সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানব। প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের সাথে সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সুন্নত সালাত রয়েছে। যেমন - ফজরের ফরজের আগে দুই রাকাত সুন্নত সালাত। সেটার গুরুত্ব খুবই বেশি।কারণ রাসূল (সা:) এটিকে কখনো ছাড়েননি এবং এর সব সম্পর্কে বলেছেন যে এর সাওয়াব অত্যন্ত বেশি। এরপর রাত্রের নফল সালাত এবং

সালাতুল বিতর। রাত্রের নফল সালাত কোনটা?যেটা রাসুল (সা:) ঘুম থেকে ওঠে আদায় করতেন। তাহাজ্জুদের সালাত যাকে বলা হয়। সেটাকে সালাতুল বিতর বলা হয়ে থাকে। বিতর অর্থ বিজোড়। সেই সালাত কিন্তু বিজোড় হিসেবে আদায় করতে হয় অর্থাৎ এক রাকাত যোগ করে সে সালাতকে বিজোড় করে ফেলা হয়। হয় এক রাকাত না হলে তিন রাকাত না হলে পাঁচ রাকাত না হলে সাত বা নয় বা **১১**বা **১৩** রাকাত সালাত রাসূল (সা:) এভাবে আদায় করতেন।

এই রাত্রের তাহাজ্জুদ সালাতের অনেক ফজিলত বা উপকারিতা রয়েছে। আমাদের সাহাবারা খুব চেষ্টা করতেন এটা আদায় করার জন্য। রাসূল (সা:) এর জন্য এই সালাত কিন্তু আল্লাহ তাআলা ফরজ করে দিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় এবং আমরা চেষ্টা করব যেন দুই রাকাত হলেও এটা আদায় করতে পারি ইনশাআল্লাহ। ফজরের সালাতের **১০**মিনিট আগে উঠে কিন্তু আমরা এই দুই রাকাত নফল সালাত এবং এক রাকাত বিতর সালাত আদায় করে ফেলতে পারি। তারপর হচ্ছে কুনুত। এই সালাত টা সাধারণত আদায় করা হয় এশার সালাতের পর।তবে যারা তাহাজ্জুদ পড়ে অভ্যস্ত বা সালাতুল বিতর সালাত পড়ে অভ্যস্ত তারা সেটাকে রাত্রির নফল সালাত বা তাহাজ্জুদের পরে আদায় করবেন। এরপর রয়েছে সালাতুত দোহা।এই সালাতুত দোহা হচ্ছে ফজরে সূর্য ওঠার পরে **১৫**থেকে **২০**মিনিট পরে যে দুই রাকাত বা চার রাকাত আদায় করা হয় তা এবং সেটাকে ইশরাকের সালাত ও বলা হয়ে থাকে।আর সূর্য উঠে যাওয়ার পর পরে যে সালাত আদায় করা হয় সেটাকে চাশত বা দোহার সালাত বলে। আবার সূর্য যখন একেবারে মধ্য আকাশে আসে তার **১৫**থেকে **২০** মিনিট আগে কিছু সালাত আদায় করলেও তাকে দোহার সালাত বলা হয়। এই দোহার সালাতের তিনটি নাম। এশরাক চাশত এবং দোহা।সময়ের কারণে তিনটি বিভিন্ন নাম দেয়া হয়ে থাকে। এরপর তারাবির সালাতের কথা বলা হয়েছে। যেটা আমরা রমাদান মাসে আদায় করে থাকি। এই সালাতের অত্যন্ত ফজিলত রয়েছে। তারাবির সালাত কিন্তু আমরা এশার সালাতের পরে বা মাঝ

রাতে আদায় করতে পারি অথবা তাহাজ্জুদের সময় আদায় করতে পারি। সময়ের কারণে এই সালাতের নাম ভিন্ন ভিন্ন। আমরা এশার পরে সালাত আদায় করলে তাকে তারাবি বলি আর মাঝরাতে বা তাহাজ্জুতের সময় আদায় করলে সেটাকে বলে কিয়ামুল লাইল।অথবা শেষ রাতেরটা তাহাজ্জুদের সালাত ও বলা হয়। এই সবগুলি কিন্তু তারাবির সালাতের নাম। যে যখন ইচ্ছা সেটা আদায় করতে পারে। আবার যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় তখনও কিন্তু সালাত আদায়ের নিয়ম রয়েছে। বৃষ্টিপাতের সময় ও সালাত আদায় করা যায়। সেটাকে বলা হয় সালাতুল ইসতিশকা।তারপর তাহিয়্যাতুল মসজিদ। মসজিদে যখন আমরা সালাত আদায় করতে যাই তখন সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করে আমরা সেখানে বসি। এটাকে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' বলা হয়।তারপর ওযুর পরবর্তী সালাত রয়েছে। যে কেউ এটা করতে পারেন। যখনই আমরা ওযু করব তখনই আমরা দুই রাকাত সালাত আদায় করবো। এগুলো আসলে অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। তারপর যখন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয় সেই সময়ের পরে এবং ইকামতের আগে আমরা চাইলেই দুই রাকাত সালাত আদায় করতে পারি। ইকামত হচ্ছে ফরজ সালাত শুরুর ঘোষণা।অর্থাৎ ইকামত দেওয়ার পরেই ফরজ সালাত দাঁড়িয়ে যাবে। সেই সময় আর কোন সালাত আদায় করব না। তবে আযান ও ইকামতের মাঝখানে আমরা চাইলে সালাত আদায় করতে পারি।

তারপর হজ্জের সময় বা ওমরা বা অন্য কোন সময় কেউ যদি কাবা ঘরে যায় এবং তাওয়াফ করে, তাওয়াফের পরে কিন্তু দুই রাকাত সালাত পড়ার বিধান রয়েছে। সেটাও কিন্তু নফল সালাত। এরপর রয়েছে ইস্তেখারার সালাত। যখন আমরা কেউ কোন কাজ করতে চাইবো যেমন- বাড়ি করতে চাইবো বা বিশেষ লেখাপড়া বা চাকরিতে ঢুকতে চাইবো তার আগে দুই রাকাত সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাইতে পারি এবং আল্লাহর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিতে পারি যে, আমাদের জন্য যেন সেটাই হয় যেটা আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে এবং দীনের জন্য কল্যাণকর। এটাই হচ্ছে ইস্তেখারার সালাত। এই সালাত অত্যন্ত বরকতের।তারপর তাওবার সালাত রয়েছে।

যে কোন গুনাহ আমাদের দিয়ে হয়ে গেলে আমরা দুই রাকাত সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারি। তওবা এমনিতেও করা যায়। আর সফর থেকে ফেরার সালাত। যখন আমরা কোনো সফর থেকে ফিরলাম তখন আমরা মসজিদে বা ঘরে ঢুকে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে পারি। এভাবে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারি।

এই সবগুলোই নফল বা ঐচ্ছিক সালাত। এগুলো করার মধ্য দিয়ে আমরা বেশি বেশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারব। এগুলো আল্লাহর নৈকট্য এর কারণ। এগুলো আমাদের সাওয়াব পাওয়ার কারণ এবং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ কিন্তু আমাদের ফরজ সালাতের দোষ-ত্রুটিগুলো মাফ করে দেন।

বে-নামাজীর শাস্তি

নামাজীর শাস্তি

নামাজ হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া ফরজ বিধান।যারা এই ফরজ বিধান না মানে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া এবং আখেরাতের দিনে কঠিন আযাব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

অর্থঃতাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।(আল-বায়ান)১

সালাত ত্যাগকারীর ইহকালীন বিধান

জীবনের বরকত কেড়ে নেওয়া হয়।চেহারা হতে নেককারদের জ্যোতি মুছে ফেলা হয়।সালাত আদায়কারী মুসলিম নারীর সাথে বেনামাযীর বিয়ে দেওয়া নাজায়েয।তার

অভিভাবকত্ব বিলুপ্ত,তার জবাহকৃত মাংস খাওয়া নাজায়েয,সে তার কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে না।তেমনি তার আত্মীয়গণও তার থেকে কোনো অংশের অধিকারী হবে না,মারা গেলে তার জানাযা আদায় করা যাবে না,তার ক্ষমা ও করুণার জন্য দো'আ করা যাবে না,মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না এবং সে দীনী ভাই হিসেবে গণ্য হবে না,বরং তার থেকে বিমুখ হওয়া ও তার সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন করা ওয়াজিব।২

সালাত ত্যাগকারীর পরকালীন বিধান:

কেয়ামতের দিন বে নামাজীকে সাক্কার নামক স্থানে নিক্ষেপ করা হবে;

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের জিজ্ঞেস করবেন,

مَا سَلَكَكُمۡ فِيۡ سَقَرَ.قَالُوۡا لَمۡ نَكُ مِنَ الۡمُصَلِّيۡنَ .

অর্থঃকিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল?তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। (আল-বায়ান)৩

১,সূরা মারইয়াম,আয়াত:৫৯

২,শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীনের "সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান" নামক রিসালা থেকে সংকলিত।

৩,সূরা মুদ্দাসিসর ,আয়াত:৪২-৪৩

(২) কিয়ামতের দিন কাফির সরদার কারূন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে বেনামাযীর হাশর হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে:

»من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف«

“যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের
হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির‘আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ইমাম আহমদ রহ. এ হাদীসকে সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরীর ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা বড় বড় কাফিরদের সাথে বেনামাযীর হাশর হওয়ার জন্য তার কুফুরী সাব্যস্ত হওয়া চাই। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “এই চার জনকে বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের নেতা।

(৩) বেনামাযী জাহান্নামে যাবে, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ٤٣﴾ [المدثر[٤٢، ٤٣ :

“তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।” [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৩]

(৪) বেনামাযী স্বীয় পরিবার এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله«

“যে ব্যক্তির আসর সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।” (সহীহ মুসলিম)

অতএব, যে সমস্ত সালাত ছেড়ে দেয় তার কি অবস্থা হবে?

58 / 60

(৫) বেনামাযীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের এক খালে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾ [مريم : ٥٩]

“তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই “গাইয়া” প্রত্যক্ষ করবে।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯]

আপনি কি জানেন “গাইয়া” কী? গাইয়া হলো, জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ, যার গভীরতা অনেক, যেখানে রয়েছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ। (তাফসীর ইবন কাসীর)

নামাজকে এক প্রকার সামাজিক ইবাদাত ও বলা যায়।কারণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মুসলমানগণ একস্থানে মিলিত হোন।একে অপরের খুঁজ-খবর নিতে পারে।এতে সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি পায়।নামাজে সকল ভেদাভেদ ভুলে একসাথে দাঁড়ায়।ফলে সালাত আদায়কারীর মধ্যে সাএতেসাম্য সৃষ্টি হয়।এতে সামাজিকতা আরও বৃদ্ধি পায়।